প্রান্তজনের পানি ইশতেহার

WaterMove

পানি অধিকার
প্রচারাভিযান

প্রান্তজনের পানি ইশতেহার- এই প্রস্তাবনাটি ‘পানি অধিকার প্রচারাভিযান’-এর উদ্যোগে গত এক বছর ধরে উপকূলীয় এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠি, নাগরিকসমাজ, গবেষক, এক্টিভিস্ট, গণমাধ্যমকর্মী, উন্নয়নকর্মীদের সাথে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে একটি খসড়া তৈরি হয়। পরবর্তীতে খসড়া ইশতেহারটির ওপর কয়েকজনের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সেটি চুড়ান্ত করা হয়।

এই জনদাবি গুচ্ছ তৈরির জন্য বিগত এক বছর ধরে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা, শরিয়তপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় একাধিক পরামর্শ সভা, সংলাপ গণশুনানী, গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। এই সকল আয়োজনে স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মোট মুদ্রিত সংখ্যা : ২০০০
প্রকাশ : ১৬ অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা সহায়তা : একশনএইড বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট দেশের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে উপকূলবর্তী ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষের বসবাস; যাদের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষই নিরাপদ উৎস থেকে সুপেয় পানি পায় না এবং দেড় কোটি মানুষ নানা মাত্রার নোনা পানি পানে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু উপকূলেই নয়; এখনো দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতাংশ মানুষ সহজে নাগালের মধ্যে এবং দূষণমুক্ত উৎস থেকে নিরাপদ পানি পান না।

বাংলাদেশের উপকূলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি, ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস এবং বৃষ্টির পানি থেকে খাবার পানি জোগাড় করে। ২০১৯ সালে আইলার প্রভাবে উপকূলের অনেক পানির উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে গৃহস্থালি, সেচ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাপকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর তিন হাজার দুইশ কোটি ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। শুকনো মৌসুমে অধিকাংশ নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আবার যতটুকু পানি পাওয়া যায় তাও অতিরিক্ত আয়রন ও আর্সেনিকের কারণে পানের কিংবা ব্যবহারের উপযোগী নয়। অন্যদিকে, নব্বইয়ের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিজমি ও জলাধারে নোনাপানি আটকে রেখে চিংড়ি চাষের ফলে কোনো কোনো এলাকায় মাটি ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততার হার বাড়ছে। সেই সাথে উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নোনাপানির অনুপ্রবেশের ফলেও পানির লবণাক্ততা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নিরাপদ পানির সংকট যেমন বাড়ছে, একই সাথে নানান রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা। কৃষি

উৎপাদন হ্রাস এবং গাছপালা ও ফসলি জমি বিলীন হওয়ায় জীববৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

নিরাপদ পানি সকল মানবাধিকারের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫-তে সকল নাগরিকের 'অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা'র অঙ্গীকার করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মানুষের পানির অধিকার বাস্তবায়ন এবং পানি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩, জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১৪ ইত্যাদি আইন-নীতি রয়েছে। কিন্তু জাতীয় অঙ্গীকার এবং বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে নিরাপদ পানির সংকট কমছেই না, বরং প্রকটতর হচ্ছে। নিরাপদ পানি মানবাধিকার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে না বরং ব্যাপকভাবে পানির বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অতি আসন্ন। রাজনৈতিক দলসমূহ ইতোমধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির জন্য কাজ করছে, যার প্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিবর্তীতে তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে। আমরা বাংলাদেশের উপকূলীয় সকল মানুষের জন্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানিপ্রাপ্তির বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেখতে চাই; এবং গণমাণুষের পক্ষে দশটি দাবি তুলে ধরছি। দাবিগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় বিপন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানির সংকট লাঘবে ভূমিকা রাখা সম্ভব।

প্রস্তাবনা- ১

বাংলাদেশ পানি আইনের ধারা-১৭ অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা

অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে পানি সংকটের ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সংকটে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করার জন্য বিপন্ন জনগোষ্ঠীর পানি চাহিদা পূরণে বিশেষ এবং পরিস্থিতি-নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা ছয়টি হটস্পটের একটি হলো উপকূলীয় অঞ্চল, যেটি মূলত পানি ও জলবায়ু-উদ্ভুত সমস্যাবহুল অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। উপকূলীয় অঞ্চলকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে পানির সম্পদ, চাহিদা এবং এসব এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, এই অঞ্চলের পানি সংকট সমাধানে সময়োপযোগী প্রস্তাবনা, বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

প্রস্তাবনা- ২

বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক [Ecosystem] টেকসই পানীয় জলের উৎসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা

সকলের জন্য সহজে নাগালের মধ্যে নিরাপদ পানিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক টেকসই নিরাপদ পানির উৎসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট রকমের পানি ব্যবস্থাপনা যেমন রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার এর মতো নির্দিষ্ট একক উৎস নির্মাণ না করে পানির উৎসের দূরত্ব, সহজপ্রাপ্তি বিবেচনায় মিশ্রিত পানি পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের 'গাঙ্গেয় কটাল পললভূমি' 'মধ্য-মেঘনা পললভূমি', নিম্ন-মেঘনা পললভূমি' ও মেঘনা মোহনার নবীন পললভূমি' কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মাটির প্রকারভেদ, জলপ্রণালী, জোয়ারভাটা, চাষপদ্ধতির ধরন ও মৌসুমের ভিত্তিতে চিহ্নিত স্থলাঞ্চলসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পানির উৎস সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

নিরাপদ পানির সর্বজনীন, ন্যায্য ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও অগ্রাধিকার প্রকল্প গ্রহণ করা

অঞ্চলভিত্তিক পানি সংকটের কারণ, ধরন ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে পানি পরিষেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে পর্যাপ্ত বাজেট এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গবেষণা ফলাফল থেকে দেখা যায়, ওয়াশ খাতে এডিপি বরাদ্দ আপাত ঊর্ধ্বমুখী হলেও বস্তুত পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এই আনুপাতিক বৃদ্ধির হার [৫.৪৪%] সামগ্রিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির [এডিপি] বৃদ্ধির হারের [৭.৪%] তুলনায় কম। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে উপকূল রক্ষা, নদী-জলাশয়, বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, গবেষণা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় নজরদারির মতো বিষয়ে বাজেটে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ ছিল না একইসাথে উপকূলের টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহে সরকারের নেওয়া প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রেও নতুন কিছু যুক্ত হয়নি। বিশেষ করে উপকূলীয় দুর্গম এলাকাসহ উপকূলীয় সকল জেলায় বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি প্রাপ্তি বিষয়ক অবকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করা

বাংলাদেশ ‘পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০’ অনুসারে ‘পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা’ এর মাধ্যমে সকল নদী, জলপথ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর ওপর অর্পিত। সংস্থাটির কাঠামোগত এবং অবকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলীর মধ্যে নিরাপদ পানি পরিষেবা পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনার দায়িত্ব যুক্ত করা জরুরি। বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী, উপকূলে লবণাক্ততা নিরসন এবং সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্য নিরাপত্তা ও পানিসংক্রান্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ৪ এর বিধান অনুযায়ী ‘জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ’ গঠন করা হয়েছে। এই পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে বাংলাদেশে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার, নিরাপদ আহরণ, সুষম বন্টন, সুরক্ষা ও সরংক্ষণ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কথা বলে থাকলেও পরিষদের এই কার্যাবলীগুলো দৃশ্যমান নয়।

কৃষিসেচে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বন্ধ করে, ভূ-উপরিস্থ সেচপানির উৎস ও ব্যবহার বাড়াতে হবে

বাংলাদশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত মোট পানির ৭৮ ভাগ পানিই ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। সেচ বা অন্যান্য প্রয়োজনে যে হারে ভূগর্ভস্থ পানি তোলা হয় সেই হারে প্রাকৃতিকভাবে পানি মাটির নিচের মুক্ত জলবাহী স্তরে (অ্যাকুইফায়ার) পানি প্রবেশ করে না। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৫ সালে সেচের জন্য স্যালো মেশিনের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮০০টি যা ২০১৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ লাখে। নোয়াখালী অঞ্চলে বিএসডিসি কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্যালো মেশিন বসিয়ে সেচের পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর দ্রুত নেমে গেছে এবং মানুষ টিবউওয়েল থেকে সুপেয় পানি পাচ্ছে না। বাংলাদেশ পানি আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সীমিত পানির এই অপরিকল্পিত ও অপরিমিত ব্যবহার, অপসারণ এবং একইসাথে দূষণ বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেচকার্যের জন্য স্থাপিত সকল অবৈধ স্যালো মেশিন অপসারণ করতে হবে এবং সাবমারসিবল পাম্পের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও সম্মেলন)-এর ঘোষণা মোতাবেক পানির ব্যবহার এবং উৎসের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তাবনা- ৬

পানি পরিষেবা সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতি, চর্চা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা জনবান্ধব ও উন্নত করার মাধ্যমে পানি পরিষেবার শতভাগ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা

গবেষণার ফলাফল এবং প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ন্যায্য, সহজে পাওয়া যায় এমন ব্যবস্থা, টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং পানি পরিষেবাকে অবকাঠামোগত উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পানি পরিষেবার কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে ধারাবাহিক গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে ও এতে জনগণের সক্রিয় সমপৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। উপকূলীয় এলাকার পানি সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়। যে কোনো ধরণের প্রযুক্তি পরীক্ষার-নিরীক্ষার পাশাপাশি কমিউনিটির নিজস্ব জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং স্থানীয় সমাধানগুলো বিবেচনায় নিতে হবে এবং পরীক্ষিত জ্ঞানসমূহ সরকারি উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। পানির উৎস, বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ চর্চাকে একীভূত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাগুলোতে দক্ষ সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রস্তাবনা- ৭

মিঠা পানির উৎস ভরাট ও দূষণ রোধ এবং নিরাপদ পানির উৎস নষ্ট করে এমন যে কোনো ব্যক্তিগত বা শিল্প উদ্যোগ বন্ধ করা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি আটকে রেখে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের ফলে লবণাক্ততা বেড়েছে। এমনকি নদীর পানির লবণাক্ততার চাইতেও আটকে রাখা পানিতে লবণাক্ততা বেশি পাওয়া গেছে। ফলে উপকূলীয় এলাকার মিঠাপানির উৎসগুলোর একটি বড় অংশ লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০-এ বলা হয়েছে, নদী, খাল-বিল, হাওর, দিঘি, ঝর্ণা, বন্যাপ্রবাহ এলাকা, বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন সব এলাকা প্রাকৃতিক জলাধার, জলাশয় বা জলাভূমি হিসেবে পরিগণিত হবে। ২০২০ সালে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুরকেও প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞাভুক্ত করে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, এই জলাধার কোনোভাবেই ভরাট করা যাবে না। কিন্তু, উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রামে বিগত ৪০ বছরে বিলুপ্ত ২৪ হাজার পুকুর-দিঘি। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করেই পুকুরসহ জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি-কলকারখানাসহ নানা অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও জলাশয় ভরাট করে সরকারি অবকাঠামোও গড়ে উঠেছে।

পতিত জমিতে নতুন জলাধার খনন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির পুনঃব্যবহার জোরদার করা

দেশের সর্বত্রই পানির উৎসগুলো দখল-দূষণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিক ও অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি তোলা হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমাতে, বিশেষত পানি সংকটাপন্ন এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এলাকাভিত্তিক বরপিট খাল, জলমহাল, ছোট-বড় খাল-সহ সকল ধরণের সাধারণ সম্পদই দখল হয়ে গেছে; পানি সংরক্ষণের জন্য কোনো উৎস আর অবশিষ্ট নেই। তাই, দেশের পতিত জমিতে জলাধার খনন, কুয়া খনন, শুকিয়ে যাওয়া নদী, খাল, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, লেক ইত্যাদি খনন করে গভীরতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে সব মৌসুমেই পানি সংরক্ষণ করা যায়। ব্রি' উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি পুকুরে সংরক্ষণ করে তার মাধ্যমে সেচ প্রয়োগ করে সফলভাবে রবি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে; এই কৌশলকে আরো দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে।

প্রস্তাবনা- ৯

নিরাপদ পানির অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগসমূহকে একত্রিত করে সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করা

বাংলাদেশ সংবিধানের সাথে সাথে বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ ধারা-৩ এ সুপেয় এবং ব্যবহার্য পানি অধিকারকে সর্বাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পানি সংকট নিরসনে সরকারি নানা উদ্যোগ রয়েছে, সেই সাথে বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানও পানির ব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত এবং প্রায়োগিক দক্ষতায় বিভিন্ন উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছে। যৌথভাবে সমন্বিত কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সকল ধরণের পরিষেবা ও দক্ষতাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে সবার জন্য সুপেয় পানি প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, রাজধানীতে ওয়াসা প্রতি ইউনিট (এক হাজার) লিটার পানি সরবরাহ করতে করে ৮.৪৯ টাকায়। অন্যদিকে, সাতক্ষীরায় ২০ লিটার পানি কিনতে ১০ টাকা খরচ করতে হয়। পানির এই মূল্য শহরের তুলনায় উপকূলীয় এলাকায় ৪০ শতাংশেরও বেশি। তাই, সুপেয় পানি প্রাপ্তি মানুষের সর্বাধিকার বিবেচনা করে উপকূলীয় মানুষের জন্য ন্যায্য, নিরাপদ, পযাপ্ত সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং পানি বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে।

প্রস্তাবনা- ১০

উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানির চাহিদা যোগানের প্রক্ষেপণ ও পরিকল্পনা নিশ্চিত করা

শিল্প কারখানা এবং বিভিন্ন প্রকল্পে লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির ক্ষয় এবং পণ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ঝুঁকি এড়াতে মাত্রাহীনভাবে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার কথা বলা হয়ে থাকে। ফলে, এই সকল শিল্প এলাকায় খুব কম সময়ের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির সংকট দেখা দেয়। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন চলছে। কিন্তু, কেনো প্রকল্প এলাকা আসন্ন সময়ে পানির চাহিদা এবং যোগান নিয়ে কোনো ধরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। সরকারের জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ অনুসারে, শিল্পাঞ্চলের কারণে আগামী ২০ বছরের মিরসরাই অঞ্চলে ৩.২ মিলিয়ন মানুষের আগমন ঘটবে। তখন পানির চাহিদা হবে দৈনিক ৬৪ কোটি লিটার। কি করে এই বিশাল চাহিদা যোগান দেওয়া হবে সেটি নিয়ে কোনো পরিকল্পনা দেখা যায়নি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুসারে, গত ৪০ বছরে চট্টগ্রামের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২০ মিটার নেমে যাওয়ায় জেলার ৭৫ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ পানি সংকটে ভুগছে। তাই, উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রকল্প গ্রহণ বা শিল্প বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির চাহিদা এবং যোগানের প্রক্ষেপন করতে হবে এবং নিজেদের উদ্যোগে পানির যোগান নিশ্চিত করতে

‘পানি অধিকার প্রচারাভিযান’ বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকার সকল মানুষের জন্য বিনামূল্যে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত সুপেয় পানির নিশ্চিত করার দাবিতে গড়ে ওঠা একটি নাগরিক প্লাটফর্ম। উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, যুব সংগঠন, এক্টিভিস্ট, গণমাধ্যমকর্মী এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণে এই প্লাটফর্মটি গড়ে উঠে।

এই ক্যাম্পেইন বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান
বাড়ি ১৪৭, সড়ক ১০, নতুন হাউজিং এস্টেট
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী।

ফোন : +88 0233 4433 565
ইমেইল : praanbd.org@gmail.com
www.pranbd.org

পানি অধিকার প্রচারাভিযান- এর অংশীদার সংগঠনসমূহ: